যুগান্তর

তারিখ 29 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

উচ্চশিক্ষার সংস্কার ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের উচ্চশিক্ষার অঙ্গন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাবল্যে উদ্বেলিত হচ্ছে। দৃশ্যত সরকারি মালিকাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এখন দেশে বেসরকারি মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি। শীতল যুদ্ধাবসানোত্তর বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ এবং বৈশ্বিকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সর্বত্র অগ্রতিরোধ্য গতিতে প্রায় সব ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের মহোৎসব শুরু হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। বাংলাদেশে আজকাল কারণে-অকারণে বেসরকারিকরণের জোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মতো। স্বল্প জনসমর্থন রয়েছে এমন কিছু বামদল ছাড়া পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতা মেনে নিয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো ছেড়ে দেয়ার বেলায় তেমন কারও কোন ওজর-আপত্তি দেখা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রীয় খাতগুলোর অব্যবস্থাপনা ও সীমাহীন লুটপাট চলে আসছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানায় বিকাশের মধ্যে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা চলছে। তবে এযাবৎকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় খাত থেকে লুটপাট করে যারা অবৈধভাবে টাকা কামিয়েছে তারাই হয়তো বর্তমান বেসরকারিকরণ ও ব্যক্তিমালিকানায় বিকাশের নীতির দ্বারা যোলআনা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিমালিকানায় বিকাশকে সামষ্টিক কল্যাণের সঙ্গে সমান্তরাল বা একীভূত করার মানসে তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্র এখনও অর্জন করতে পারেনি। বরং অপরাজনীতির কারণে ওই লুটেরা গোষ্ঠী 'পাবলিক পলিসি' নির্ধারকের পর্যায়ে নিজেদের অধিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অর্থাৎ তারা আজকাল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় ওইসব লুম্পেন এবং লুটেরা গোষ্ঠীর হাত থেকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ 'কোরামসমূহ' পুনরুদ্ধার করতে না পারলে ব্যক্তিমালিকানার ধারায় রাষ্ট্রের ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্যের উন্নতির ভাবনা স্বপ্নই থেকে যাবে। তাই কেবল তীব্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সৎ নিবেদিতপ্রাণ এবং সর্বোপরি যোগ্য ও পেশাদারিত্ব সম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমেই দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের উচ্চশিক্ষার চালচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এক্ষেত্রে চলছে এক ভয়াবহ ও বিপদসঙ্কুল অবস্থা। সুষ্ঠুনীতি ও পরিকল্পনা ছাড়াই দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সম্ভবত এ ধরনের নীতি গ্রহণের পেছনে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের চেয়ে রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রান্তি (ব্যবসা-বাণিজ্য ও মুনাফা) বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থাৎ এর ভেতর দিয়ে অনুমোদন দানকারী রাজনীতিক এবং আশপাশগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের লাভবান করেছে। অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী কম ঝুঁকিতে ও স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে অধিক মুনাফা লাভ করার একটি উর্বর ক্ষেত্র হাতে পেয়ে গেছে। অন্যদিকে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু দেশীয় পুঁজিপতি নয় সেই সঙ্গে বিদেশী পুঁজিপতিরাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। যার জন্য কোনরূপ নিয়মনীতি না মেনেই ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে এ দেশে তথাকথিত শাখা খুলে চুটিয়ে বাণিজ্য করা হচ্ছে। দলীয় সরকারগুলো বিশেষ করে বিএনপি কর্তৃক পরিচালিত সরকার (১৯৯১-৯৬) এবং বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের হাতে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের নামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বর্তমানে এর বাণিজ্যিক পরিণতি লাভ করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামক লাগামহীন ঘোড়ার গলায় লাগাম পরাতে ইউজিসি'র বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রফেসর আসাদুজ্জামান চেষ্টা করার পরও সফল হয়েছিলেন একথা বলা যাবে না। ১/১১ পটপরিবর্তনের ফলে সর্বত্র সংস্কার প্রত্যাশী অন্তর্বর্তীকালীন ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন বলে পত্রপত্রিকার সূত্রে জানা যায়।

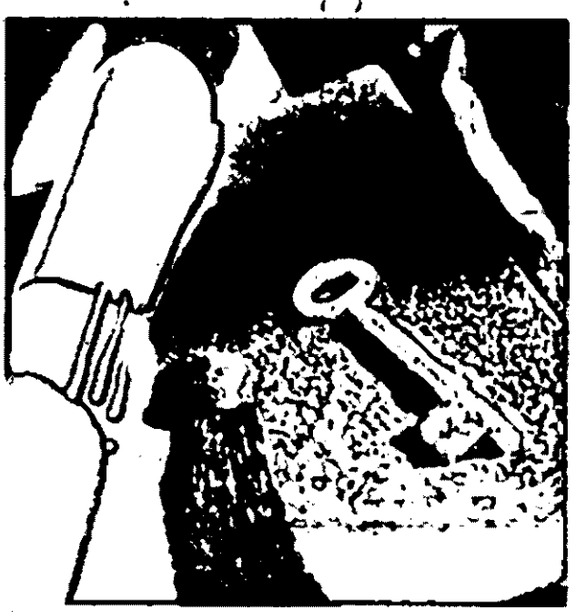

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে আদালতের আশ্রয় নিয়ে সংস্কারকে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত করার নীতি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সরকারের উচ্চ মহলসহ মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির ওপর নানারকমের চাপ প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার কর্মসূচি ব্যাহত করতেও তৎপর রয়েছে। অবৈধভাবে পরিচালিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রায় ৫৪টি শাখা বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করতে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস দৌড়ঝাঁপ দিচ্ছে। উচ্চশিক্ষার একটি বড় অংশ যে আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের কব্জায় বন্দি হতে চলেছে তা সহজেই অনুমেয়। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য তথা শুধু মুনাফার লোভে পরিচালিত হচ্ছে এবং হাতেগোনা দু-একটি ছাড়া প্রায়গুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে চটকদার বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। অথচ এগুলোর ভেতরটা একদম ফাঁপা!! তারা উচ্চমাত্রার ফি'র বিনিময়ে সার্টিফিকেট বিক্রি করে যাচ্ছেন। তাই কেউ কেউ এসব প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না বলে সার্টিফিকেট বিক্রির 'দোকান' বলে চিহ্নিত করতে চান। বিবিএ, এমবিএ, ইংরেজি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফার্মেসি, আইন, কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সচরাচর এসব প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন বিভাগ নেই। অর্থাৎ শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে না দেখে বাজার চাহিদা মোতাবেক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। 'আংশিক' বা 'বাছাই'মূলক এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকারান্তরে ওইসব প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিরই নামান্তর। ফলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য তথা আলোকিত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার কথা। এতে করে মানবিক মূল্যবোধসহ প্রগতি এবং সভ্যতার অগ্রগতি হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ওইসব প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক, শিক্ষা সামগ্রী ও বিদ্যা আয়তনিক পরিবেশ নেই বললেই হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হয়ে থাকে। ফলে মানসম্মত শিক্ষার্থীর অভাব অনুভূত হয়। এ কথা সত্য যে, দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যত শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে থাকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার খুব স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখার সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয় তার মধ্যে অন্যতম প্রধান যুক্তি হল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত আসন সংখ্যা। প্রশ্ন হল উচ্চশিক্ষাকে কতটুকু উন্মুক্ত রাখা হবে? উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষার দরজা খুবই সীমিত। কেননা একটি দেশে কর্মসংস্থানের গড় হিসেবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত জনবলের চাহিদা খুব কমই হয়ে থাকে। এমএ, এমএসএস ডিগ্রি পাস করে পিওন বা পাহারাদারের চাকরি করছে দেশে এমন নজিরও আছে। অথচ ওইসব চাকরির জন্য এসএসসি বা এইচএসসি সার্টিফিকেটই যথেষ্ট ছিল। সুতরাং উচ্চশিক্ষার দরজা অবারিতভাবে খুলে রাখার যৌক্তিকতা আছে কী? বরং উল্টো এর মাধ্যমে দেশে 'হোয়াইট কালার বেকার' পয়দা করা হচ্ছে। ডাক্তারি বিদ্যা 'অর্জন না করেই যিনি ডাক্তারি করার সনদপত্র পেয়ে যাচ্ছেন তিনি কী বিপজ্জনক নন? অথচ দেশে এসব ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বিতরণের কাজ থেমে নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত (মূল্যায়ন) বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকারান্তরে বাণিজ্যিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কী পড়ানো হচ্ছে, কিভাবে পড়ানো হয়, কে পড়াবেন, কতক্ষণ পড়ানো হবে, কিভাবে পাস-ফেল নির্ধারিত হবে ইত্যাকার বিষয়গুলো স্বাধীন ও অবাধভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেড়ে দেয়ার ফলে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ খুব সঙ্গতভাবেই শিক্ষার মানকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ, শিক্ষক বাছাই, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি কাজকর্ম চলছে খেয়ালখুশি মতো। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় কি? অতএব কালবিলম্ব না করে অচিরেই উচ্চ শিক্ষার নামে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করা দরকার। সেজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই কিছু বিধিবিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যায় :

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের চূড়ান্ত অপব্যবহার রোধকল্পে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (Private University Regulatory Authority) সৃষ্টি করতে হবে। ওই কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত সমুদয় কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করবে। এর ফলে স্বায়ত্তশাসনকে পুঁজি করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে ফাটল ধরবে এবং বলা বাহুল্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।

২. দেশের আনাচে-কানাচে এবং বিভিন্ন শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো কালবিলম্ব না করে বন্ধ ঘোষণা করা দরকার।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মানসম্পন্ন ক্যাম্পাস নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে স্বতন্ত্র পাঠাগার, খেলাধুলার মাঠ, শরীরচর্চার সুব্যবস্থা, চিকিৎসা কেন্দ্র, শিক্ষার্থী নিবাস থাকা আবশ্যক।

৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দূরশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম রহিত করতে হবে।

৫. মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হতে হবে।

৬. পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। এটি অবশ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও প্রযোজ্য হবে। প্রচলিত পঠন-পাঠন এবং পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা কোন একটি কোর্স সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান (A to Z) লাভের প্রয়োজনবোধ করে না। সীমিতসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে খুব ভালোভাবেই পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব। এতে করে ওই কোর্স সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা খণ্ডিত ও ভাসাভাসা কিছু ধারণা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ কোন জ্ঞান লাভ করে না। ফলে অজ্ঞ ও অর্ধশিক্ষিত হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়ে যায়।

অতএব, পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন বদলানো প্রয়োজন। একটি কোর্সের সম্ভাব্য সমুদয় প্রশ্ন (১০০টিও হতে পারে) আগে থেকে প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নেবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরবরাহকৃত প্রশ্নগুলো থেকে 'র‍্যান্ডম' পদ্ধতিতে প্রতিটি কাগজে দুই বা তিনটি প্রশ্ন লিখে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করলে কোর্সের সম্ভাব্য সব প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থীরা সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়বে। ফলে তাদের জ্ঞান এবং জানার যন্ত্রণা বেড়ে গিয়ে মানসম্মত পর্যায়ে উন্নতি হবে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এ পদ্ধতি চালু আছে।

বেসরকারি ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উপযুক্ত ধারায় সংস্কারের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ সম্পূর্ণভাবে অর্জন ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীরাও প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ : *প্রফেসর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*